ফিরে চাই

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

জানা অজানা যেসব দেশ সেবক দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মাহুতি দিয়েছেন বা বহু দুঃখকষ্ট-লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এবং স্বাধীনতা লাভের পর আজও যাঁরা দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করলেম।

ইতি

গ্রন্থকার

কেমন করে আমার জীবনের গতির মোড় ঘুরে গেল— আমি স্বাধীনতা অর্জনের পথে পা বাড়ালেম এবং ওই পথে চলতে গিয়ে পথের মাঝে যাঁদের জেলখানার ভেতরে বা বাইরে দেখলেম, তাঁদেরই মধ্য থেকে অল্পসংখ্যক লোকের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সকলের সম্পর্কে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নয়। দেশ এখন স্বাধীন—এই স্বাধীন দেশের পাঠক পাঠিকা সমাজের কাছে যদি উৎসাহ পাই, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে বা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব। এই গ্রন্থখানি আমি (১) পথের সন্ধানে, (২) স্বাধীনতার পথে ও (৩) অন্ধ করার অন্তরালে—এই তিন পর্বে শেষ করলেম। "অন্ধকারার অন্তরালে" যে সব সমাজবিরোধী কয়েদিদের দেখেছি, তাদের মধ্যকার কয়েকটি প্রধান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করলেম।

ইতি—

শ্রী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

প্রথম পর্ব

(পথের সন্ধানে)

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই"।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই মর্মস্পর্শী সার্থক কবিতাটি পরাধীন ভারতের (বর্তমানে স্বাধীন ভারত ও আজাদ পাকিস্তানের) স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী কর্মীদের ঘরছাড়া দুঃখকষ্টের জীবনে তখনকার দিনের প্রভু ইংরেজ সরকারের কৃপায় (!) বাস্তব সত্যরূপে একটা অনির্বচনীয় সুখ ও শান্তির পারাবার হয়ে দেখা দেয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের গত চল্লিশ বছরের আমার জীবনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বারে বারে মনে পড়ছে এই কবিতাটিই; আর সাথে সাথে সাড়া জাগিয়েছে অন্তরের অন্তঃস্থলে সুমধুর স্মৃতিগুলো। স্বদেশের মুক্তিসাধনার আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক দীক্ষা হয় একটি বিপ্লবী সংস্থা "অনুশীলন সমিতির" মাধ্যমে। তারপরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" যখন একটা গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন

আমি বিপ্লবী সংস্থার বাইরে এসে কংগ্রেসে যোগ দিই। স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্যরূপেই আমার সাধ্যমতো সকল শক্তি দিয়ে স্বাধীনতা দেবীর সেবা করতে চেষ্টা করেছি।

কথায় আছে গরিবের ছেলের ঘোড়া বাতিক। আমারও কি তা-ই হয়েছিল? যার অনাথিনী বিধবা মা, একটি নাবালক ছোটো ভাই ও একটি নাবালিকা ছোটো বোন-এর ভাত জোটে না, যে নিজে নাটোর ছোটো তরফ রাজ এস্টেটের সাহায্যে ও অনুগ্রহে তাঁদেরই আশ্রয়ে থেকে পড়াশোনা করছে—পড়াশোনায় যে ভালো ছেলের মধ্যেই গণ্য ছিল, একদিন যার, জীবনের লক্ষ্য ছিল পড়াশোনায় ভালোভাবে পাশ করে বড়ো সরকারি চাকুরে হয়ে দেশের মধ্যে 'দশজনের একজন' হয়ে, মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর করবে, তার হঠাৎ মতিভ্রম (!) ঘটল কেন—তার মাথায় স্বাধীনতার বাতিক (!) চেপে উঠে জীবনের গতিপথ পালটে দিল কেন? এইটে কি গরিবের ছেলের ঘোড়া-বাতিক নয়? এ প্রশ্নটা অনেকের মনে ওঠাই খুব স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে যে পরিবেশের মধ্যে আমার জন্ম, জ্ঞানোন্মেষ ও বৃদ্ধি এবং তখনকার দিনে দেশে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল, সেই সম্পর্কে সম্যক জানা দরকার। তাই, সেই সম্পর্কেই কিছু এখন বলছি।

ভাগ্য আমাদের—আমাকে ও আমার মা-ভাই বোনকে দীন দরিদ্রের পর্যায়ে এনে ফেলেছিল বটে কিন্তু আমার যে পরিবারে জন্ম, সে পরিবার মোটেই দরিদ্র ছিল না। বরং তাঁদের একটি অতি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত জমিদার ও গৃহস্থ ধনী পরিবার বলা যেতে পারে। চৌ-কোঠা মিলান চার-মহল বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বাড়ি, সদর দরজার চার ইঞ্চি মোটা বিরাটশালকাঠের কপাট, যার উপরে দু ইঞ্চি চওড়া মাথাওয়ালা বহু সংখ্যক লোহার পেরেক-বসানো, যে দরজা দিয়ে আরোহীসহ কুঠিয়ার পাঁচআনি রাজবাড়ির হাতি মাঝে মাঝেই বাহির বাড়ির প্রাঙ্গনে এসে হাজির হত—হাতির উপরের সওয়ার থাক্‌তেন রাজ-অমাত্যগণসহ আমার পিতামহ এবং সদর দরজার দুই পাশের ঘরে সিপাহি-সান্ত্রিরা ঢাল-তলোয়ার-লাঠি সোটা সহ সর্বক্ষণের জন্য পাহারারত থাকত এমনই এক বাড়িতে এবং এমনই একটি পরিবারে আমার জন্ম হয়। আমাদের বাড়ির সদর দরজার বাইরে আর একটি মহল বা চত্বর ছিল—সেটা হল গোশালা। বিরাট গোশালাটি গাই, মহিষ,

বলদে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষির কাজে লাগানোর জন্য ছোটো বড়ো অনেকই হিন্দু-মুসলমান কিষান ছিল। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক পরবর্তী কালের মতো মোটেই তিক্ত ছিল না, বরং একটা আত্মীয়তার ভাব বিরাজ করতেই আমি বাইরে থেকে দেখেছি। হয়তো একপক্ষের কিছুটা অনুকম্পা-প্রদর্শন ও অপরপক্ষের মর্যাদাবোধের অভাবই তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িক প্রশান্তির মূল কারণ ছিল। কারণ যা হোক, আমি দেখেছি ওইসব চাকর-কিষানের দলই আমাদের মতো শিশুদের রক্ষক ও অভিভাবক ছিল। কিষানদের মধ্যে মহিম, মুকুন্দ, ছেপাত, কুতব (সকলেই মুসলমান) প্রভৃতির মধ্যে কাউকে 'জ্যাঠা' ও কাউকে বা "কাকা" বলে আমি ডাকতেম। তারাও অভিভাবকের মতোই আমাকে ভালোবাসত, আবার প্রয়োজন বোধে শাসনও করত। যখন শাসন করত, তখন সেই শাসনের আমার তো কোনো দিনই কোনো রূপ প্রতিবাদ করার সাহস হয়ইনি, তাদের বিরুদ্ধে পরিবারের কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অভিযোগ করার দুঃসাহসও জোগায়নি। তখন আমার মনে হত আমরা বোধহয় সবাই একই পরিবারের লোক।

কিষান মজুরের দল ছাড়াও বাড়ির অন্দরমহলে বাইরের কাজ করার জন্য মুসলমান মেয়েরাও ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের কথা আজও আমার মনে পড়ে। তাঁকে আমি "বিরো-মা" বলে ডাকতেম। আমার বাবা-কাকারাও তাঁকে "বিরো-মা" বলেই ডাকতেন। তিনি আমার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ থেকে সকলেরই "বিরো-মা" ছিলেন। তিনি আমারও "মা"। আবার আমার বাবা-কাকাদেরও "মা" ছিলেন। মা যেমন সন্তানকে কোলে-পিঠে করে 'মানুষ' করেন, তিনিও নাকি তেমনই ভাবে বাবা- কাকাদের এবং আমাকেও 'মানুষ' করেছিলেন। তাই তিনি আমাদের সকলেরই "বিরো-মা" ছিলেন। আমার মনে পড়ে তিনি আমাকে ছোটোবেলায় ভাতও খাইয়ে দিতেন এবং খেতে খেতে আমি দুষ্টুমি করলে 'দুমদাম' করে পিঠে কিলটা চড়টাও দিতেন; আবার মায়ের মতো ভালোও বাসতেন।

সত্যিকথা বলতে হলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ওইসব কৃষক-মজুর-রাখালের দলই ছিল আমার সত্যিকারের অভিভাবক, বন্ধু ও সখা,—এদের সাথেই আমার দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত—তাই, তাদের পরিবেশের ভালো-মন্দও আমার মনের উপরে ছোটবেলায় অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে

যেমন তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের দোলা দিয়ে যেত, আবার তাদের চাষিসুলভ অশ্লীল শব্দবিন্যাসও আমার আয়ত্বে এসে গিয়েছিল এবং আমি তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলে। সেজন্য আমি পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে অনেক সময় প্রহৃতও হয়েছি। এই গেল আমার বাইরের জীবনের একদিকের কথা। আবার অন্যদিকে অন্দরমহলের জীবনে রাতের কিছুটা অংশ আমার কেটেছে 'বিরো-মা'র কাছে। তাঁর কাছে শুয়ে তাঁর বৃদ্ধা বয়সের দুগ্ধহীন শুষ্ক স্তন টানতে টানতে "সোনাভান" ও "হাতেম তাই" -এর কত বীরত্বের 'কেচ্ছা' শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি—শুনেছি, আমার জন্মের অব্যবহিত পরেই আমার মা বাতে পঙ্গু হয়ে মরণাপন্ন হন। জন্মের পর থেকে ছয়মাসকাল আমি মাতৃস্তন্য-দুগ্ধ পাইনি। দুগ্ধবতী অনেক জানা-অজানা নারীরই নাকি স্তন্যদুগ্ধ আমি পান করেছি। একবার নাকি এক সাপুড়ে বেদেনির স্তন্যদুগ্ধ আকণ্ঠ পান করে প্রবল উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি মারা যেতে বসেছিলেম। বিধাতাই বোধহয় নানা ঘটনাচক্রে আমার জন্মের পর থেকেই আমাকে সকলের কাছেই ঋণী করেন। অর্থের বিনিময়ে যে ঋণ শোধ করা যায় না সে ঋণ শোধ করতে চাই দরদভরা মনের নিঃস্বার্থ সেবা। পূর্বেই বলেছি, আমার শৈশবের দিনগুলোর অধিকাংশ সময়ই কেটেছে সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের লোক-জনদের মধ্যে, তাই তাদের জীবনের সুখ-দুঃখও আমার মনের উপর সেই শিশুকালেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাবই হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ রাজনীতিক জীবন গড়ে ওঠার গোড়ার কথা। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দরিদ্র জনগণের দুঃখের অনুভূতি আমার প্রাণে যে সাড়া আজও জাগায় তার প্রথম শিক্ষা বোধহয় আমার হয় সমাজেই নিম্নস্তরে প্রতিষ্ঠিত এইসব ঝি, চাকরবাকরদের কাছেই।

মনে পড়ে, আমাদের গ্রামে "হলার মা" বলে অতি দরিদ্র এক বৃদ্ধা অন্ধ জেলের মেয়ে ছিল। তার 'হলা'কে আমি কোনোদিন দেখিনি—'হলা' হয়তো আমার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই মরে গিয়েছিল। স্বামী-পুত্র মরলেও মানুষের পেট তো মরে না—পেটে খিদেও লাগে এবং সে খেতেও চায়। "হলা'র "মা" ও তাই পেটের খিদেয় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চারটি ভাত ভিক্ষা করতে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কোথাও তিরস্কৃত হয়ে সরে পড়তে বাধ্য হত, কোথায়ও বা ভিক্ষার জন্য নির্বন্ধাতিশয্যে প্রহৃতও হত, আবার কোথায়ও বা অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে ভাত-ব্যঞ্জন দিয়ে পরিতোষ সহকারে আহারও জুটে

যেত। এটাই হল দরিদ্রের দৈনন্দিন জীবনধারা। এই "হলার মা" যেদিন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আমাদের বাড়ি আসত, সেদিন তাকে খেতে না-দেওয়া পর্যন্ত আমারও খাওয়া হত না—আমি বেঁকে বসতেম যে ওকে ভাত যতক্ষণ না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুতেই খাব না। সে এলে ভাত তাকে দেওয়া হতই, তবে মা-খুড়িমারা ঠাট্টা করে বলতেন,—"প্রভাসের শাশুড়ি এসেছে, ওকে আগে ভাত দেও।"

দীনদুঃখী-দরিদ্রের ক্লিষ্ট জীবনের ব্যথা, আমার স্নেহময়ী মার এবং ছোটো কর্তামার (আমার বাবার ছোটো খুড়িমা) অন্তরেও একটা প্রবল সাড়া জাগিয়ে তুলত। আমার ছোটো কর্তা-মার হৃদয় অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিল। লোকের দুঃখ মোটেই দেখতে পারতেন না। তিনি ছিলেন বড়েলোকের ঘরের মেয়ে এবং হয়েছিলেনও বড়োলোকের ঘরের বউ,—মনও ছিল তাঁর অত্যন্ত বড়ো এবং মহৎ। তাঁর শেষ বয়সে দেখেছি, গ্রামের হিন্দু-মুসলমান যার বাড়িতেই কারও কোনো কঠিন অসুখের কথা তিনি শুনেছেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি তার বাড়িতেই গিয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। পরে, পড়তি অবস্থায় সংসার যখন তাঁর ছেলেদের হাতে, তখন নবান্নের উৎসবের দিনে একজন দরিদ্র ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে এলে তিনি ওই ভিক্ষুককে চাল-ডাল-তরিতরকারি সহ একটা মোটা রকমের সিধা সাজিয়ে ভিক্ষা দেন এবং সেজন্য তিনি তাঁর ছেলেদের কাছে তিরস্কার হন। সেই তিরস্কারের বেদনা তাঁর মনে এতই কঠিন আঘাত করে যে তিনি আর সেদিনের উৎসবের অন্ন গ্রহণ না করে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে একটি মহাপ্রাণ শেষ হয়ে যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের মুখে একমুঠি অন্ন তুলে দিতে গিয়ে।

আমার মা-ও ছিলেন অনুরূপই করুণাময়ী। দুঃখীজন দেখলেই তিনি নিজের খাওয়ার কথা না ভেবেই যা ঘরে থাকত তা উজাড় করে ওই দীন জনকেই দিয়ে দিতেন। কতদিন দেখেছি, মা আমার নিজের মুখের ভাত সম্পূর্ণ ভিক্ষুককে ধরে দিয়ে সারাদিন অভুক্তই থেকেছেন। দরিদ্রের জন্য আমার মনে সমবেদনার অনুভুতি বোধ জেগেছিল অতি শৈশবকাল থেকেই এই সব পারিপার্শ্বিক চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবে এবং তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার চাপে। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বোঝানোর জন্যই আমার পারিবারিক জীবন ও তৎকালীন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাটা জানা দরকার, যার ফলে